নজরুলের লোক সুরের গান

দেবাশীষ বেপারী*

[সারসংক্ষেপ : বাংলা গানের অসামান্য প্রতিভাধর সঙ্গীতকার নজরুল আবহমান বাংলার লোক সুরের ধারায় তাঁর সৃষ্টিশীল জীবনে বহুসংখ্যক গান রচনা করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম সংগীত ভাবনায় ও রূপায়ণে লোক-জীবনের বিচিত্র রূপের প্রকাশ করেছেন আপন মনের মাধুরীতে। বাংলার প্রকৃতির সুশীতল ও ছায়াঘেরা পথ-প্রান্তর, দিগন্তজোড়া মাঠে সবুজ শোভার ঢেউ খেলে যাওয়া, কাঁদা-মাটি-জলে ঝলমল করা ধরণীর লাবনী – পল্লি মায়ের এমন সব রূপের মায়ায় পড়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এসব কারণেই পল্লিসুরকে আরও জীবনঘনিষ্ঠ করার উপলক্ষ্যে, লোক-সুরের সমস্ত ধারায় গান রচনা ও সুরারোপ করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। লোকসুরের বিচিত্র ধারায় গান রচনা করে সুরের ভুবনে অমর হয়ে আছেন তিনি। লোক-সংগীতের প্রচলিত মায়াভরা সুরের সাথে নজরুলের সুরের পার্থক্য, সুরের গঠন, বাণীর বৈভব, বাণীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সুরের পরশে লোকধারার যেসব অনুষঙ্গের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বাংলা গানের ভুবনে, তারই একটি রূপ চিত্রিত হয়েছে এই প্রবন্ধে।]

লোকসংগীত বাঙালির অন্তরে জীবন্ত ঐতিহ্য রূপে বিরাজিত। এদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে লোকগান ও লোকসুরের প্রচলন দীর্ঘদিনের। লোকসংগীত এদেশের লোকসংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। এই সংগীতরীতি দ্বারা এদেশের গ্রামীণ জীবনে বসবাসরত সাধারণ মানুষের সৃষ্ট গানকে বোঝায়। এ দেশের লোক সংগীতের সুরে এদেশেরই জনমানুষের পাওয়া-না পাওয়া-হাসি-আনন্দ-বেদনার অনুরণন বিরাজমান। বাংলাদেশের লোককথায় এবং লোকসুরে প্রাণের ও ভাবের যে আকুতি, অনুভূতি, কামনা-বাসনা প্রকাশিত, পৃথিবীর ইতিহাসে তা বিরল। এদেশের লোকসংগীতে নদীর প্রসঙ্গ এসেছে অনেক বেশি। লোকগীতি, লোকবাদ্য, লোকনৃত্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট এ গান। লোক-মানস থেকে উদ্ভূত সংগীত যা ক্রমে লোকমুখে প্রচারিত হয়ে সমাজে বিকশিত হয়। লোকসংগীত মূলত দেশের প্রকৃতিকে অবলম্বন করে বিকাশ লাভ করে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় (১৯০৫-১৯১১) লোকসংগীতের সুরে স্বদেশি গান রচনার মধ্য দিয়ে বাংলা গানে লোকধারা বেগবান হয়। বঙ্গভঙ্গের সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকসুরে স্বদেশি গান রচনা করে এ ধারা প্রবর্তন করেন। বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী লোকসংগীতের সুরভঙ্গি বিভিন্ন ধরনের গানে প্রযুক্ত হতে থাকে, আবহমান বাংলার চিরায়ত সংগীতের মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং লোকসংগীত বাঙালির সাঙ্গীতিক জাতীয়তাবোধ প্রকাশের মাধ্যমে পরিণত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম সেই ধারাবাহিকতায় বহু রকমের গান রচনার সাথে সাথে লোকসুরেও গান রচনা শুরু করেন। কয়লা খনি অঞ্চলের সাঁওতালি জীবনধারায় রচনা করলেন মন মাতানো ঝুমুর গান, বেদ-বেদেনীদের জীবনযাপনের নানা অনুষঙ্গ নিয়ে রচনা করলেন ঝাপান গান, উদাস বাউলের সহজ সরল সুর

*সহযোগী অধ্যাপক, সংগীত বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।

নিয়ে রচনা করলেন বাউল গান। আবার ভাটির স্রোতে পাল তোলা নৌকায় অলস মাঝির হাল ধরা হাতে নদীবক্ষ হতে দিগন্তছোঁয়া গানের টান নিয়ে সৃষ্টি করলেন অসাধারণ সব ভাটিয়ালি গান, ভাওয়াইয়া গান তৈরি করলেন মৈশাল ও মাহুতদের কণ্ঠ থেকে সুর নিয়ে। শ্রমিকদের ছাদ পেটানোর গান পর্যন্ত রচনা করলেন নজরুল। বৃষ্টিবহুল অঞ্চলের নরনারীদের কণ্ঠের বর্ষা বিষয়ক গান নিয়ে রচনা করলেন কাজরি।

সুরকার হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের সামর্থ্য প্রশ্নাতীতভাবে নৈপুণ্যধারী। বাংলা গানের সুর নির্মাণে সফল সংগীতকার হিসেবে বিবেচিত নজরুল। লোকসংগীতের ব্যতিক্রমী ও অপ্রচলিত ধারাসহ বাংলা গানের সকল ধারায় কাজী নজরুল ইসলাম গান রচনা ও সুরারোপ করেছেন। তিনি শ্রোতাদের কাছে সংগীতকার হিসেবে অতিমাত্রায় সফলও হয়েছেন। ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহ্য বহনকারী লোকধারা থেকে আহরিত সুর নিয়ে নজরুল তাঁর গানে লোকসুরের যে ধারা তৈরি করেছেন, তা আজ যুগোত্তীর্ণ এবং অন্য গানের নিরিখেও সম্পূর্ণ আধুনিক। নজরুলের অনন্য সৃষ্টি সম্ভারের মধ্যে লোকগান একটি বিশিষ্ট ধারা। গ্রামীণ সুরের আবহে রচিত ও সুরারোপিত, মায়া জড়ানো প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ, বাংলার সরল জনজীবনের প্রতিচ্ছবি নজরুলের লোকঅঙ্গের গান বাঙালি শ্রোতাদের কাছে বিশেষ ধরনের শ্রুতিমধুর গান। নজরুলের রচনার মাঝে লোকসুরের ঝুমুর গানের সংখ্যা সব থেকে বেশি। নজরুলের লেটো গানের সংখ্যাও অনেক। যদিও সে গান শৈশবে কাঁচা হাতে তৈরি করা, তবুও সে গানের রচনামান অত্যন্ত গুরুত্ববাহী। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে নজরুল উপমহাদেশের বহু স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং প্রকৃতির অবারিত রূপমাধুরীতে মুগ্ধ হয়ে গান রচনা করেছেন। নদীমাতৃক বাংলার শীতল ছায়াময় প্রান্তর, নদীর মাঝির গানের টান, পল্লি বাউলের বাঁশি আর একতারার মন হরণ করা সুর কাজী নজরুল ইসলামের সুরের অনুভূতিকে, সৃজনসত্তাকে নিবিড়ভাবে উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। নজরুলের জন্মস্থান বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, যা গ্রাম-বাংলার আদর্শ পল্লিরূপেরই প্রতিনিধিত্বশীল স্থান। নজরুলের শৈশব ও কৈশোরের দুরন্ত দিনগুলি গ্রামীণ প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে কেটেছে নিবিড়ভাবে। শ্যামলবরণ বাংলা মায়ের নয়নাভিরাম রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন যেন প্রকৃতির চাদরে শুয়ে। এই পরিবেশের সকল কিছুই নজরুলকে লোকধারার বৈচিত্র্যময় গানের বাণীর ও সুরের আবেশ যুগিয়েছে প্রাণে। তরুণ কবি উপমহাদেশের বিখ্যাত সব অঞ্চলে ঘুরেছেন বিভিন্ন সাহিত্য আড্ডা, গানের জলসা, সভা-সম্মেলনে যোগ দেয়ার উপলক্ষ্যে। এসব অঞ্চলের নদী, ভূ-প্রকৃতি, বন-বনানী, বিচিত্র জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, আদিবাসী সাঁওতালদের জীবনধারা, বেদে-বেদেনীদের নানা স্থানে ছুটে চলা জীবন, ধু ধু মেঠোপথ নজরুলের লোকমানস গঠনে ভূমিকা রেখেছে। মাঝি-মাল্লাদের উজান-ভাটার টানে নৌকা ভাসিয়ে মনের সুখে গান ধরা, মহিষ ও গরুর গাড়ির চালক গাড়িয়াল ভাইদের উঁচু-আঁকা-বাঁকা পথে বিরহী মনের গান গাওয়া নজরুলকে লোকগান সৃজনে উদ্বুদ্ধ করেছে। বর্ষণমুখর দিনে কৃষকের গলা ছেড়ে গানের সাথে লাঙ্গল ধরে জমি চাষ করা, গাছের ছায়ায় রাখাল বালকের ক্লান্ত দেহের বিশ্রামের সময়ের গান, বর্ষায় ভরা নদীতে নৌকা বাইচ ও সারি গান, লালমাটির দেশের কয়লা খনি অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনের রূপ নজরুলকে সফল করেছে লোকসংগীতের ধারায় সঙ্গীত সৃজনে। আবার ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর সুরসম্ভার থেকে সুরসঞ্চয় করে তাতে ইরান, মিশর ও আরবের পল্লিসুর মিলিয়েও কোন কোন লোকগানে ব্যবহার করেছেন নজরুল। নজরুল তাঁর

সংগীত জীবনে লোকসংগীতের নবধারার সুরসৃজনে বিভিন্নভাবে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। রাগসুরেরও মূল আধার যে লোকসুর, তার সাথে নজরুলের অবিচ্ছেদ্য নাড়ির সম্পর্ক ছিল। নজরুলের পূর্বেকার রামপ্রসাদ সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অতুলপ্রসাদ সেনের মতো সংগীতকাররাও লোকসঙ্গীতের বাউল ধারা নিয়ে বহু গান রচনা করেছেন। কিন্তু ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, ঝাপান, ঝুমুরসহ লোকসঙ্গীতের অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত নানা সুরভঙ্গিতে বাংলার আবহমান ধারাটি কাজী নজরুল ইসলাম সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় করে প্রকাশ করেছেন।

লেটো

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান অঞ্চলের একপ্রকার গ্রামীণ লোকসংগীত লেটো গান। এ শিল্পরীতি রাঢ় বাংলার লোকসংস্কৃতির এক বিশেষ ধারা। কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্য ও সঙ্গীতের সূত্রপাত হয়েছিল বর্ধমান অঞ্চলের চুরুলিয়া গ্রামের লোক অঞ্চলের পালা গানের দলের 'লেটো গান' থেকেই। নজরুলের কবিজীবন, শিল্পীজীবন, সুরসাধক জীবনের সূত্রপাত এই লেটো গানের দল থেকেই। নজরুলের চাচা কাজী বজলে করীমের মাধ্যমে লেটোর দলে তাঁর প্রবেশ। কিশোর বয়সে নজরুল এক আশ্চর্য জীবন-সংগ্রাম শুরু করেছিলেন। তখনকার সময় কিশোর কবি রচিত বিভিন্ন পালাগান আর অভিনয় উপভোগ করার জন্য দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ লেটোর আসরে ভিড় জমাতো। বর্ধমান অঞ্চলের শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের ঘরে ফসল তোলার পর অবসর সময়ের বিনোদন হিসেবে লেটো গানের আসর বসত। অভিনয়, নৃত্য ও যন্ত্র সহযোগে যাত্রাগানের মতোই পালাগানের আকারে পরিবেশন করা হতো লেটো গান। আসর বন্দনার মধ্য দিয়ে গানের শুরু এবং সাধারণত কিশোর বালকরা মেয়েদের পোশাক পরিধান করে লেটো দলের নটীর চরিত্রে অভিনয় করত। লেটো গানে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পৃক্ততা বিষয়ে করুণাময় গোস্বামী লিখেছেন :

> চুরুলিয়ার দিকে সে সময় লেটো গানের খুব জনপ্রিয়তা। গ্রামে গ্রামে লেটোর দল। যাত্রা ও কবিগানের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল লেটো। কবি গানের মতো দুই দলে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জয় পরাজয়ের ভিত্তিতে লেটো গান অনুষ্ঠিত হত। কবিয়ালের মতো লেটোর দলেও থাকতেন একজন দলপতি। নিজের দলের জন্য গান বাঁধা ছাড়াও আসরে দাঁড়িয়ে দল পরিচালনাও করতেন নজরুল। লেটোতে বিষয়ভিত্তিক পালা থাকত। যাত্রার ধরনে অভিনয় ও নাচ ছিল লেটো রূপায়ণের অঙ্গ। [...] মক্তব আর খাদেমগিরি ছেড়ে এবার এলেন লেটোর দলে যোগ দিতে। অধিকন্তু অর্থোপার্জনের আশায় ও সহজাত সংগীতপ্রিয়তা এ দুয়ের প্রেরণায়ই নজরুল লেটোর দলে যোগে দিয়ে থাকবেন। এ ব্যাপারেও তাঁর পথপ্রদর্শক ছিলেন পিতৃব্য কাজী বজলে করীম। তিনি ছিলেন নিমসা গ্রামের লেটোর দলের পরিচালক। তাঁর মাধ্যমেই লেটোর সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ঘটে। লেটোর দলের গান বাঁধা, পালা রচনা করা, আসরে দাঁড়িয়ে দল পরিচালনা করা, সবই তিনি জেনে নিয়েছিলেন বজলে করীমের কাছ থেকে। তাছাড়া চুরুলিয়া অঞ্চলের সে সময়ের বিখ্যাত লেটো পরিচালক শেখ চকোর গোদাও তাঁকে স্বস্নেহে লেটোর পাঠ দিতেন। (করুণাময়, ১৯৯৬ : ২)

হাস্যরসাত্মক এই লোকধারার গান উনবিংশ শতকের শেষ দিকে প্রচলন হয়েছিল বর্ধমান অঞ্চলে। আত্মতৃপ্তি ও মনোরঞ্জনের পাশাপাশি এই গানের দর্শক-শ্রোতারা বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ে অবহিত

হতো এ গানের মাধ্যমে। লেটো গানের মধ্যে আবার কয়েক রকমের ভাগ ছিল। যেমন : সঙের গান, বন্দনা গান, চাপান গান, ঠেস গান, ছড়ার গান প্রভৃতি। ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন দাবি অনুযায়ী সে সময় এই বিচিত্র রকম লেটো গান লিখে দিতেন নজরুল। বর্ধমান অঞ্চলে দারুণভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল লেটো গায়ক, রচয়িতা, সুরকার, অভিনেতা কিশোর নজরুল। নজরুলের শৈশবের সে সংগীত জীবনে আরবি-ফারসি শব্দ ও বাক্যের সমন্বয়ে রচিত বিভিন্ন ভাষায় এক দিনে অন্তত ১৪/১৫টি করে গান লিখে, সুর দিয়ে আবার অন্যদের কণ্ঠে সে গান তুলে দেয়ার মতো সামর্থ্য অর্জনও করেছিলেন। সংগীত সৃজনের প্রাথমিক জীবনে প্রাণের আরামে, মনের আনন্দে প্রতিভার এক অবাক করা খেলায় মেতে ছিলেন চুরুলিয়ার দুখু মিয়া খ্যাত নজরুল। বর্ধমান অঞ্চলের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করার কারণে ভৌগোলিকভাবে কাজী নজরুল ইসলাম শৈশব থেকে হিন্দু, মুসলিম, আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অত্যন্ত নিকটে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন বলে লেটোর গান রচনার মধ্যে সেসব বিষয়বস্তু অনায়াসে স্থান পেয়েছে। যেমন : রামায়ণ গান, নগর কীর্তন, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, পদাবলি কীর্তন, লক্ষ্মীর পাঁচালি প্রভৃতি। অন্যদিকে গাজীর গীত, ফকিরি গান, সত্যপীরের গান, পুঁথিপাঠ, কেচ্ছা-কাহিনির আসর, বিয়ের গীত প্রভৃতি। কাজী নজরুল ইসলামের রচিত লেটো গানের সংখ্যা অনেক। কিশোর বয়স থেকেই কাজী নজরুল ইসলামের লোকসংগীতের প্রতি আকর্ষণ ছিল। নজরুলের লেটো গানে তাই হিন্দু-মুসলিম উভয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও অনুসর্গের সহাবস্থান প্রকাশ পেয়েছে। বহু বিচিত্র বিষয়ে একই সময়ে গান রচনার হাতেখড়ি নজরুলের এই লেটোর দলেই প্রথম হয়েছে। নজরুল পরিণত বয়সে বিশেষ করে গ্রামোফোন কোম্পানির সংগীত-জীবনে লেটোর-জীবনের মতোই আবার একই সাথে বসে বিচিত্র বিষয়ে বহুগান একসাথে রচনা করেছেন। নজরুল প্রায় ৩০টি পালা রচনা করেছিলেন তার মধ্যে অন্তত ১০টির নাম জানা যায়। লেটোর দলে যেসব পালা রচনা করেছেন নজরুল ইসলাম তার মধ্যে অন্যতম : 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'শকুনি বধ', 'কবি কালিদাস', 'যুধিষ্ঠির', 'দাতাকর্ণ', 'ঠগপুরের সঙ', 'আকবর বাদশাহ', 'রাজপুত্র', 'মেঘনাদ বধ', 'চাষার সঙ' প্রভৃতি। সামাজিক রঙ্গরস ও গ্রামীণ জীবনধারা এ গানের আসল বিষয়বস্তু। তবে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক অন্যান্য ধর্ম বিষয় অবলম্বনেও বহু লেটো গান রচিত হয়েছে নজরুলের হাতে। যেমন :

করো ভাই বন্দেগী খোয়াইও না আর অবহেলায় জেন্দেগী
শরমেন্দেগী হবে হাশরের মাঝে। (করুণাময়, ১৯৯৬ : ২)

ঝুমুর গান

ঝুমুর গান মূলত প্রত্যন্ত অঞ্চলবাসী সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ঢংয়ের প্রচলিত গান। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর গানে এই ঢং ব্যবহার করেছেন উল্লেখযোগ্যভাবে এবং এ গানকে বাংলা গানের এক বিশিষ্ট উপাদানে পরিণত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ :

তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে একা বসে থাকি
তুমি যে পথ দিয়ে গেছ চলে তারি ধূলা মাখি হে।
যেমন পা ফেলেছ গিরিমাটির রাঙা পথের ধূলাতে,
অমনি করে আমার বুকে চরণ যদি বুলাতে,
আমি খানিক জ্বালা ভুলতাম ঐ মানিক বুকে রাখি হে। (রশিদুন্, ২০১৪ : ১৯২)

নজরুলের জন্মভূমি বর্ধমানের চুরুলিয়ার নিকটবর্তী সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকায়। নজরুলের কবিমানসে সাঁওতালি জীবনধারার প্রভাবও পড়েছিল তাই বেশি পরিমাণে। বাংলা গানের পঞ্চপ্রধান কবিদের মধ্যে একমাত্র নজরুলের জন্মভূমিই ছিল ঐ ঝুমুর অঞ্চলে। এই রাঢ় (ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরস্থ পশ্চিমবঙ্গের অংশবিশেষ) অঞ্চলের বিভিন্ন লোকধারা তাঁর হৃদয়ে স্থায়ী আসন করেছে ছোটবেলায় যখন তিনি লেটো গানের দলে যোগ দিয়েছেন। বাংলাদেশের ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়ার পাশাপাশি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান অঞ্চলের লোক সংগীতের এই ধারায় বহু গান রচনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম এবং তাঁর সৃজন সক্ষমতার যথার্থ উপহার দিয়েছেন বাঙালি শ্রোতাদের। নজরুলের রচিত সকল ধারার গানের মধ্যে সৃজন বৈশিষ্ট্য এবং সংখ্যার বিচারে লোকসংগীতের স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা গানের কোনো স্বনামধন্য রচয়িতার হাতে ঝুমুরের ঢং অবলম্বন করে সংগীত রচনার ঘটনা নজরুলের হাতেই প্রথম, সেদিক থেকে কাজী নজরুল ইসলাম ব্যতিক্রম উদাহরণ সৃষ্টি করছেন গানের ভুবনে। রাগ সংগীতপ্রেমী নজরুলের লোকধারার সুরের সাথে অচ্ছেদ্য টান ছিল আমৃত্যু। বিশেষ করে সাঁওতাল আদিবাসীদের ঐতিহ্যবাহী ঝুমুর ধারার ঢংকে অবলম্বন করে গান রচনা নজরুলের লোকধারার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ বলে বিবেচিত গানের ইতিহাসে। তাই সাঁওতালি গীত ও ছন্দের ঝুমুর গান নজরুল-সংগীতে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। উচ্ছলতাপূর্ণ এবং মৃদুরস সমৃদ্ধ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ঝুমুর গানে লম্ফ গতি যুক্ত সুরপ্রবাহ প্রকাশ পায়। গানের তালে তালে নৃত্য পদক্ষেপণের মাধ্যমে সাঁওতাল রমণীরা সারি বেঁধে ত্রিমাত্রিক ছন্দে এ গান পরিবেশন করে থাকে। লোক ধারার গানে ব্যাপক এবং নিবিড়ভাবে নজরুল ঝুমুরের ঢং ব্যবহার করেছেন এবং সফলতাও পেয়েছেন। ঝুমুর অঞ্চলের অধিবাসী হওয়ার বদৌলতে এই ধারার সুরভঙ্গি নজরুলের ধমনীতে বহমান ছিল শৈশব থেকেই। বাংলাভাষী সীমান্ত অঞ্চলে এই গানের প্রচলন বেশি। সাঁওতাল ছাড়াও মুন্ডা, ভীল আদিবাসীরা বাঁশির সুরে ও মাদলের তালে তালে গোল হয়ে নেচে গেয়ে মাতোয়ারা হয়ে এ গান পরিবেশন করে। উড়িষ্যা, বিহার, বাঁকুড়া, মানভূম, ছোটনাগপুর অঞ্চলে ঝুমুর গানের বিশেষ প্রচলন আছে। সুরলালিত্যপূর্ণ এবং কাব্য মাধুর্যময় সাঁওতালি গানের সাথে সাঁওতাল পুরুষরা মাদল বাজিয়ে নৃত্য করে। সংগীত ও নৃত্যের প্রতি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের আসক্তি বহুযুগাবধি প্রচলিত। শাল-পিয়াল-মহুয়া বনের মায়াময় রূপ, সাঁওতাল রমণীদের বিভিন্ন উৎসব পার্বণের সামাজিক রীতিনীতির চিত্র, এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের যৌথ জীবনযাত্রার চিত্র সার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে ঝুমুর গানের বিষয়বস্তুতে। কয়লা খনি অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাত্রা নিয়ে তৈরি বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'পাতালপুরী' বাণীচিত্রের জন্য নজরুল সাঁওতালি ঢঙের বেশ কিছু গান রচনা করেছেন। কয়লা খনি অঞ্চলে কবির বাড়ি হওয়ায় এ চলচ্চিত্রের গান রচনা ও সুরারোপের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হয়েছিল তাঁর।

> নজরুলের ঝুমুর গানে ব্যবহৃত 'মাদল' এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। যা পাহাড়ী সাঁওতালীদের আনন্দোৎসবে ব্যবহৃত অপরিহার্য যন্ত্রবিশেষ। প্রত্যক্ষ জীবনের বাস্তবতার ছোঁয়া মিশ্রিত বিষয়বস্তুই ঝুমুরের বৈশিষ্ট্য। নজরুলের এইরূপ গানেই আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়। (আশরাফুল, ২০০১ : ৮৬৯)

ঝুমুরের ধারায় নজরুল যেসব কালজয়ী গান সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম : 'তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে একা বসে থাকি', 'হলুদ গাঁদার ফুল রাঙা পলাশ ফুল', 'ঝুম ঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে

এল গো', 'মাদল বাজিয়ে এল বাদলা মেঘ', 'এস ঠাকুর মহুয়া বনে ছেড়ে বৃন্দাবন', 'মহুয়া বনে লো মধু খেতে সই', 'চুড়ির তালে নুড়ির মালা রিনিঝিনি বাজে লো', 'ফুল ফুটেছে কয়লা ফেলা ময়লা টবের ঝুড়িতে', 'তুমি পিরিতি কি করহে শ্যাম তৈল মেখে গায়ে লো', 'এই রাঙামাটির পথে লো মাদল বাজে বাজে বাঁশের বাঁশি', 'বাজলো শ্যামের বাঁশি', 'নিম ফুলের মৌ পিয়ে ঝিম হয়েছে ভোমরা', 'নাচের নেশায় ঘোর লেগেছে', 'ও ঝুমরো তীর ধনুক নিয়ে বলনা কোথায় যাস', 'নিশি ভোরের বেলা কাহার পাহাড়ী বাঁশি বাজে', 'চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে', 'কালো পাহাড় আলো করে কে', 'হলুদ বাটিতে হলুদ বরণ গৌর মনে পড়ে লো', 'বল সই বে স একা কেন', 'কুনুর নদীর ধারে ঝুনুর ঝুনুর বাজে', 'বাজলো শ্যামের বাঁশি', 'ঝুমুর নাচে ডুমুর গাছে ঘুঙর বেঁধে গায়লো', 'বনের হরিণ আয়রে বনের হরিণ আয়', 'ওরে ডেকে দে মহুয়া বনে' প্রভৃতি।

ঝাপান গান

বেদে-বেদেনীদের জীবনধারা নিয়ে রচিত গান ঝাপান। ঝাপানের মতো এমন নব ব্যঞ্জনায় রচিত গান কাজী নজরুল ইসলামকে আরো বেশি আলোচিত করেছে। এ লৌকিক ধারাকে কাজী নজরুল ইসলাম আপন প্রতিভার মাধ্যমে অপূর্ব করে তুলেছেন বাঙালি শ্রোতাদের কাছে। মনসা দেবী, চাঁদ সওদাগর, সাপ, বেদে-বেদেনীদের জীবনাচার, বেহুলা-লখীন্দরসহ সাপুড়িয়া সম্প্রদায়ের ভ্রাম্যমাণ জীবন প্রভৃতি এ গানের মূল বিষয়বস্তু। নজরুল যেসব ঝাপান গান রচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ', 'সাপুরিয়া রে বাজাও বাজাও সাপ খেলানোর বাঁশি', 'আয়লো বনের বেদেনী', 'ওঠাও ডেরা এবার দূরে যেতে হবে', 'চিকন কালো বেদের কুমার কোন পাহাড়ে যাও', 'ছন্নছাড়া বেদের দল আয়রে আয়', 'পিছন পথে কুড়িয়ে পেলাম হিজল ফুলের মালা', 'বাঁকা ছুড়ির মতো বেঁকে উঠল যে তোর আঁখি রে', 'কথা কইবো না কথা কইবো না বউ' প্রভৃতি গান। বাংলা লোকগানের ঝাপান নামক এ লুপ্তপ্রায় ধারাকে নতুন ব্যঞ্জনায়, নতুন সুর ভঙ্গিমায় বাংলা গানে প্রযুক্ত করে বাঙালি শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপন করার জন্য কাজী নজরুল ইসলামের এমন প্রশংসনীয় কর্মটি চিরকাল বাংলা গানের ইতিহাসে অমলিন হয়ে থাকবে। কারণ, এমন পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর মানুষজন যারা আমাদের সমাজে বহুকাল ধরে অবহেলিত, তাদের নিজস্ব রীতিতে সংগীত পরিবেশন পদ্ধতি নজরুলের মতো দিকপাল কবির বাণী ও সুরে গানের ভুবনে নবরূপে অধিষ্ঠান হয়েছে। কেনো কোনো ক্ষেত্রে ঝুমুর গানের সুরের ছোঁয়া ঝাপান গানেও লক্ষ করা যায়।

ভাটিয়ালি

প্রেমকে উপজীব্য করে মন উদাস করা সুরের নদীকেন্দ্রিক ও মাঝিকেন্দ্রিক বিশিষ্ট লোক গানের নাম ভাটিয়ালি। মাঝি-মাল্লার কণ্ঠে গাওয়া সেই গানে লৌকিক এবং আধ্যাত্ম প্রেম বিরাজমান। ভাটির টানে নৌকা ছেড়ে দিয়ে অবসরে অলস সুরে মন্থর গতিতে এ গান পরিবেশন করা হয়। জীবনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় কাজী নজরুল ইসলাম ভাটিয়ালি গানের প্রাণকেন্দ্র পূর্ব বাংলায় (বর্তমান বাংলাদেশে) বহুবার ঘুরেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতার রূপকে ভাটিয়ালি গানে প্রকাশ করেছেন। নদীর স্রোতের টানের সাথে মিল রেখেই যেন গানের সুর করেছেন কবি। তাই এ গানের সুরেও মন্থর গতি লক্ষণীয়। নদীবক্ষে খেলা করা দুপুরের ঝলমলে রোদ, বৈকালীন নদীর

নির্জনতা, সান্ধ্যকালীন গোধূলি বেলার নদীর রূপ, দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণের পাল তোলা নৌকার রূপ, নায়ের মাঝির ক্রমে অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাওয়া এসব কিছু মিলে ভাটির নদীর মাঝির গানের মনোমুগ্ধ আবেশ তৈরি হয় ভাটিয়ালি গানে। এমন সুরে মুগ্ধ হয়ে নদীর মাঝির সেই গানের সুরে গান রচনা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। সেসব গানের মধ্যে সব থেকে বিখ্যাত হয়েছিল শচীন দেব বর্মনের কণ্ঠে গাওয়া– 'পদ্মার ঢেউ রে মোর শূণ্য হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা যারে'।

সমসাময়িক অন্যান্য গীতিকার ও সুরকার কাজী নজরুল ইসলামের মতো অভিনব ঢঙে ভাটিয়ালি গান রচনা করেননি। তিনি নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদীকেন্দ্রিক জীবন-বাস্তবতার অপূর্ব ছবি এঁকেছেন এই গানে। যে সুর মধুময় করে তোলে নদীর তীরবর্তী অবারিত আকাশ বাতাস, সেই সুরই ধরা পড়েছিল নজরুলের ভাটিয়ালি গানে। নদীনির্ভর মানুষের জীবনালেখ্য সুরময় হয়ে উঠেছে সে গানে। নজরুলের ভাটিয়ালি গান : 'একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে এইতো নদীর খেলা', 'আমার সাম্পান যাত্রী না লয় ভাঙ্গা আমার তরী', 'আমার ভাঙ্গা নায়ের বৈঠা ঠেলে', 'আমার গহীন জলের নদী', 'ওরে মাঝি ভাই', 'কোন বিদেশের নাইয়া তুমি', 'কুচবরণ কন্যা রে তার মেঘ-বরণ কেশ', 'গাছের তলে ছায়া আছে সোঁত নদীর জলে', 'দুধে অলতা রঙ যেন তার সোনার অঙ্গ ছেয়ে', 'বন বিহঙ্গ যাওরে উড়ে', 'তোর রূপে সই গাহন করে জুড়িয়ে গেল গা', 'নাইতে এসে ভাটির স্রোতে', 'নদী এই মিনতি তোমার কাছে' প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে জাহিদুল কবীর *ভাটিয়ালী গানের উদ্ভব ও বিকাশ* গ্রন্থে লিখেছেন :

> ভাটিয়ালী গানের বাণীতে যে প্রেম দর্শনের বর্ণনা করা হয়েছে তার সবখানেই আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া অনুভূত হয়। দৃশ্যত মানব-মানবীর মনের কথা প্রকাশ করা হলেও এ যেন অদৃশ্যমান নদীর দুই পারে অপেক্ষারত জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা কিংবা বিরহেরই প্রকাশ গাঁথা। সৃষ্টির আদিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যেভাবে একে অপরের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, পরিচিত ছিল, ভাটিয়ালী গানে ঠিক সেই রূপ মিলনের আকাঙ্খা পুনরায় ব্যক্ত করা হয়েছে। (জাহিদুল, ২০১৭ : ৩৪)

সাধারণ অর্থে ভাটির স্রোতে নৌকা প্রবাহিত হওয়ার সময় মাঝি-মাল্লারা যে গান ধরেন উদাত্ত কণ্ঠে তাই ভাটিয়ালি গান। গাঙে ভাটির স্রোতে যখন পাল তুলে দেয় মাঝি তখন বৈঠা দিয়ে নৌকার হাল ধরে মাঝি ভাইয়েরা যে গান গেয়ে মনের শান্তি-অশান্তি প্রকাশ করে ভাটির সুরে, সেই গানই ভাটিয়ালি গান। নজরুলের গানে এমন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। যেমন : 'আমি ময়নামতীর শাড়ি দেব চল অমার বাড়ি, ওগো ভিন গেরামের নারী'। এ গানে মাঝিদের দরাজ কণ্ঠের লম্বা টানের সুরে হৃদয়ের অন্তঃপুরের নিগুঢ় অনুভূতি শ্রোতাদের সামনে প্রকাশিত হয়। লোক সংগীতের ধারায় রচিত নজরুলের ভাটিয়ালি গানের বিষয়বস্তু মাঝি-মাল্লাদের জীবনের দুঃখ-সুখের বেদনা, অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধের বিষয়। সিলেট, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনার নদী অঞ্চল বাংলাদেশের ভাটিয়ালি গানের বিশেষ অঞ্চল বলে খ্যাত। ভাটিয়ালি গানের নিজস্ব ভাবগম্ভীর ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য রয়েছে।

ভাওয়াইয়া গান

আমাদের দেশের উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত লোকসঙ্গীতের একটি ধারার নাম ভাওয়াইয়া গান। মৈশাল, মাহুত ও গাড়িয়ালরা এ গান বেশি গেয়ে থাকেন। ভাবনির্ভর গান বলে ভাওয়াইয়াকে ভাবের গান

বলেও অভিহিত করেন কেউ কেউ। উত্তরাঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষের, পল্লিবাংলার অবহেলিত জনপদের ব্যক্তি জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এ গানে।

> ভাওয়াইয়া এবং 'চটকা' গরুরগাড়ী চালকদের গান। এগুলোকে তাদের জীবন ও জীবিকা থেকে কখনো আলাদা করে দেখা যায় না। এসব গানে কোন আভিজাত্য নেই এবং পেশাগতভাবে এতে আধুনিকতারও কোন ছাপ পড়েনি। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জনমানুষের জীবনের সুখ দুঃখ ও খেটে খাওয়া মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা এই ভাওয়াইয়ার সুরে উৎসারিত। এসব গানের মাধ্যমে যে কেউ তার আপন দুঃখ বেদনা হতাশার পরিমাপ পেতে পারেন। এদের জীবন ধারনের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে মিশে আছে ভাওয়াইয়া। (মুস্তাফা, ১৯৮১ : ২৩৩)

ভাটিয়ালির মতো গানের লম্বা টানের সুরের শেষে ইচ্ছাকৃত স্বরভঙ্গন করা হয়। রংপুর, দিনাজপুর, পশ্চিম দিনাজপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আসামের ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া অঞ্চলে এ গান সব থেকে বেশি জনপ্রিয় এবং বিস্তৃত। কাজী নজরুল ইসলাম বেশ কিছু ভাওয়াইয়া গান রচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : 'পদ্ম দীঘির ধারে ধারে ঐ সখি লো কমল দীঘির পারে', 'আমি জল নিতে যাই সকাল সাঁঝে সই', 'নদীর নাম সই অঞ্জনা নাচে তীরে খঞ্জনা' প্রভৃতি। মোহাম্মদ আবুল খায়ের রচিত *নজরুল সংগীতে নান্দনিকতায়* উল্লেখ করেছেন :

> ভাওয়াইয়া উত্তরবঙ্গের গান। রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়িকেই ভাওয়াইয়ার উৎসভূমি বলে মান্য করা হয়। ভাওয়াইয়া নামকরণ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য থাকলেও ভাও বা ভাব যে এ গানের প্রাণ তাতে কারো কোনো সন্দেহ নেই। উত্তরবঙ্গের ধু ধু প্রান্তরে বা উঁচু-নিচু পথে যাত্রী নিয়ে গাড়িয়াল, মৈষাল বা মাহুত এ গান গায়। উঁচু-নিচু পথে চলার কারণে টানা সুরের মাঝে গলা ভেঙে ভেঙে বিশেষ এক ঢং সৃষ্টি করে – যা এ গানের স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য। ভাওয়াইয়া গানের উপজীব্য নর-নারীর প্রেম-বিরহ। নজরুল ভাওয়াইয়া গানের সুর মায়ায় মুগ্ধ হয়েছেন এবং বলেছেন যে, এ সুর তাঁর মনকে নিয়ে যায় পাহাড়িয়া দেশের সবুজ মাঠের আঁকাবাঁকা আলোর প্রান্তিকে, উপপ্রান্তিকে। (আবুল, ২০১৪ : ১৮১)

বাউল সুরের গান

মধ্যযুগে বাউল মতের বিকাশ হয়েছিল বলে জানা যায়। বাউলদের সাধনাতে সুফিমতের ভক্তিভাব ও বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিভাব প্রকাশ পায়। সহজ-সরল হৃদয়ানুভূতি, জীবে প্রেম, দিব্যজ্ঞানে মানুষের ভজনা করা, সহজ কথায় ও সুরে জীবনের গান গাওয়া বাউলের মূল কর্ম। গভীর আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি সম্পন্ন বাউলদের গানের কথা, কিন্তু নৃত্য দোদুল ছন্দ দোলায় সুরের সহজ-সরল প্রকাশে সে গান জীবনের ঘনিষ্ঠ হয় অনায়াসেই। করুণাময় গোস্বামী *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান* গ্রন্থে জানিয়েছেন :

> বাউল দিব্যভাবের গান। এক লৌকিক ধর্মভাষার সাংগীতিক প্রকাশ ঘটেছে এই গানে। দেহের সীমায়ই বাউল যোগী অপার রহস্য উপলব্ধি করেন। বাউল প্রাণে এক অনিঃশেষ বিচ্ছেদ বোধের তাড়না, পরম প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের এক সুতীব্র আবেগ। শক্তিতে, বৈরাগ্যে, আত্মনিবেদনে, বিচ্ছিন্নতাবোধে বাংলার বাউল এক মর্মস্পর্শী সংগীত-ধারা। (করুণাময়, ১৯৯০ : ৪১১)

কাজী নজরুল ইসলামের রচনায় বাউল গানসহ লোকসংগীতের প্রত্যেকটি ধারার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। বিচিত্র রকমের সুর নিয়ে ফলপ্রসূ সব ধারা সৃষ্টি করেছেন নজরুল। কাজী নজরুল ইসলামের গজল, আধুনিক গান, রাগপ্রধান গানের ভিড়ে লোককেন্দ্রিক গানগুলি কিছুটা অদেখার মতো রয়ে গেছে শ্রোতাদের কাছে। গ্রামোফোন কোম্পানিতে বহু লোকঅঙ্গের গান রেকর্ড করিয়েছেন এবং চলচ্চিত্রে নজরুল বহু লোকগান ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ করুণাময় গোস্বামী তাঁর *নজরুলগীতি প্রসঙ্গ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

> নজরুল ইসলামের সংগীত রচনার প্রধান প্রবণতাটি ছিল রাগসংগীতানুগ। রাগসংগীতধারা অবলম্বনে তিনি বহু বিষয়ে এমন বিপুল কাজ করেছেন যে লোকসংগীতানুগ বাংলা গানের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের বিষয়টি সহজে চোখে পড়তে চায় না। প্রকৃতপক্ষে লোকসংগীতানুগ বাংলা গানের ধারায়ও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। রেকর্ড ও সবাক চিত্রের মাধ্যমে লোকসংগীতের সুরে বাংলা গান প্রচারের যে ধারা প্রবর্তিত হয় তাতে নজরুল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। (করুণাময়, ১৯৯৬ : ২৯৮)

আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধান করেন বাউলরা। নিজের দেহের মাঝেই নিজের আত্মার অনুসন্ধান করেন তারা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর অস্তিত্ব দেহভাণ্ডে খুঁজে পান বাউল সাধকগণ। জগতের সকল মানুষের মাঝে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করেন। ঈশ্বর জ্ঞান করে মানুষের সাধন-ভজন করলে তাতেই স্রষ্টার সাধনা করা হয়। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক লোকসংগীত অবলম্বন করে সংগীত রচনার পরপরই বাংলার নাগরিক সংস্কৃতিবান লেখকদের ও সংগীত রচয়িতাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় বাংলার লোকসংগীত। *সংগীত চিন্তায়* রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন :

> আমার লেখা যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা হত। আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন্ এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে। আমার মনে আছে, তখন আমার নবীন বয়স, শিলাইদহ অঞ্চলেরই এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল: কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে! হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে। কথা নিতান্ত সহজ, কিন্তু সুরের যোগে এর অর্থ অপূর্ব জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। (রবীন্দ্রনাথ, ১৪১১ : ৩১১)

এই বাউল সুরে নজরুল লিখেছেন বহু গান। যেমন : 'আমি বাউল হলাম ধূলির পথে লয়ে তোমার নাম', 'বাঁশি বাজায় কে কদম তলায় ওগো ললিতে', 'ওগো ললিতে আমি পারিনা সহিতে শ্যামশোকে প্রাণ জ্বলেগো সদায়', 'ভবের এই পাশা খেলায় খেলতে এলি হায় আনাড়ি', 'ওহে রাখাল রাজ কি সাজে সাজালে আমায় আজ', 'তুমি দুঃখের বেশে এলে বলে ভয় করি কি হরি', 'অসীম আকাশ হাতরে ফিরে খুঁজিস রে তুই কাকে', 'গেরুয়া রঙ মেঠো পথে বাঁশরি বাজিয়ে কে যায়', 'প্রাণ বন্ধুরে! তোমার জন্য জীবন করলাম ক্ষয়', 'আমার প্রাণের দ্বারে ডাক দিয়ে কে যায়', 'এই বিশ্বে আমার সবই চেনা' প্রভৃতি নজরুল রচিত বাউল গান। এছাড়াও বাউল সুরে তাঁর বহু গান রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ :

১. পথ ভোলা কোন রাখাল ছেলে সে একলা বাটে শূন্য মাঠে খেলে বেড়ায় বাঁশি ফেলে;
২. আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল আমার দেউল আমারি এই আপন দেহ;
৩. আমি ডুরি ছেঁড়া ঘুড়ির মতন চলছি উড়ে প্রাণ সই।

কাজরি

স্নেহময়ী বাংলার প্রকৃতির মায়া সর্বদা বিরাজমান ছিল নজরুলের অন্তর জুড়ে। নজরুলের নয়ন জুড়ে ছিল সুজলা-সুফলা বাংলার নৈসর্গিক ছবি। বাংলা মায়ের আকুল করা রূপের সুধায় হৃদয় জুড়িয়েছেন কবি। চিরশ্যামল বাংলা মায়ের মনমোহিনী রূপে বিচিত্রভাবে ফুটে উঠেছে নজরুলের লোক অঙ্গের গান। বাঙলার বাউলরা নজরুলের মনমাঝে একতারার সুর বাজিয়েছিল, এদেশের ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি কবির মনকে চিরসনাতনী লোকসুরের জোয়ারে ভাসিয়েছিল। লোকসঙ্গীতের একটি ধারার নাম কাজরি। কাজরি মূলত বেনারস অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট ধারা। এই গানের গঠনশৈলীতে ঠুমরির প্রভাব এবং সুরে এক ধরনের আভিজাত্য রয়েছে। অবিরল বৃষ্টি ধারার গান কাজরি। মোহাম্মদ আবুল খায়ের *নজরুল সংগীতের নান্দনিকতা* গ্রন্থে কাজরি প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> উত্তর ভারতের কাশী, মির্জাপুর প্রভৃতি স্থানে কাজরি বা কাজলি গানের প্রচলন রয়েছে। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়াতে নতুন কাপড় পরে মনোরম সাজে সজ্জিত হয়ে কাজলি দেবীর পূজা শেষে তারা রাতভর কাজরি গান গেয়ে উৎসবে মেতে ওঠে। এ দিনে বোন তার ভাইয়ের হাতে অথবা ভাইয়ের মত যারা তাদের হাতে স্নেহের বন্ধন স্বরূপ রাখি পরিয়ে দেয়। এ জন্য এ দিনটিকে রাখি বন্ধনের উৎসবের দিনও বলা হয়। বর্ষা ঋতুর বর্ণনা বা বর্ষার অবিরল বৃষ্টিধারায় মনের অবস্থার বর্ণনা এ গানের বিষয়বস্তু। রাধাকৃষ্ণের লীলাকে আশ্রয় করে এ গান রচিত। আবার ঝুলনও এসেছে অপরিহার্য এক বিষয় হিসেবে। (আবুল, ২০১৪ : ১৮৫)

'গগনে কৃষ্ণ মেঘ দোলে', 'কাজরি গাহিয়া এসো গোপ ললনা', 'মেঘের হিন্দোলা দেয় দোলা', 'যায় রিমিঝিমি', 'শাওন আসিল ফিরে', 'এসো শ্যামল কিশোর', 'আজি এ বাদল দিনে কত কথা', 'ঝুলন দেখিয়ে দোলে নওল', 'ঝুলনের হিন্দোলা দোলে' প্রভৃতি নজরুলের কাজরি অঙ্গের গান। ভারতবর্ষের উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর, কাশি ও বারানসী অঞ্চলে এ গানের প্রচলন বেশি লক্ষ করা যায়। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ তৃতীয়া তিথিতে ওই অঞ্চলের মেয়েরা কাজলি ব্রত পালন করে। বর্ষা ঋতুতে এই শ্রেণির গান গাওয়া হয়ে থাকে। এই গানের বেশিরভাগ জায়গা জুড়ে থাকে বর্ষা ঋতুর বর্ণনা এবং প্রেমে বিভোর নর-নারীর প্রণয় কথন।

> কাজরি একপ্রকার লোকসংগীত। ভারতের কাশী ও মির্জাপুর অঞ্চলে এর প্রচলন বেশি। এই গানে বর্ষা ঋতুর বর্ণনা অধিক এবং বর্ষা ঋতুতে এই গান গাওয়া হয়ে থাকে। কাজরি ক্ষুদ্র প্রকৃতি শৃঙ্গার আদিরস প্রধান নায়ক-নায়িকার উক্তি সম্বলিত লোকসংগীত। (রশিদুন, ২০১৯ : ১০৬)

নজরুলের রচিত কাজরি গানের মধ্যে অন্যতম :

১. শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এল না বরষা ফুরায়ে গেল আশা তবু গেল না;
২. কাজরি গাহিয়া চল গোপ ললনা শ্রাবণ গগনে দোলে মেঘ দোলনা।

ছাদ পেটানোর গান

ছাদ পেটানোর গানকে কর্ম সংগীত বলা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে ভবন নির্মাণের সময় শ্রমিকদের ছাদ পেটানোর দীর্ঘ পরিশ্রমকে কিছুটা লাঘব করার জন্য বিনোদন হিসেবে এমন সংগীত গাওয়া হয়ে থাকে। অনেক ভারী জিনিসপত্র, অনেক বড় গাছের খণ্ড এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরাতে গিয়েও এমন কর্মসংগীত গাওয়া হয়। নারীরাও এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত কোনো কোনো অঞ্চলে। বর্তমান সময়ে এই প্রথা অনেকটা বিলুপ্তির দ্বার প্রান্তে। কাজী নজরুল ইসলাম ছাদ পেটানোর গান শুনে আকৃষ্ট হয়ে তেমন কিছু গান রচনা করেছেন যার মধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য : 'সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ গো, পাত ভরে ভাত পাই না ধরে আসে হাত গো।' উল্লেখ্য এই গানটি ১৯৪২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা চলচ্চিত্র 'চৌরঙ্গীর' জন্য রচনা করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

লোকসঙ্গীতের সুর জনসাধারণের অন্তরে সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম। বিভিন্ন অঞ্চলকেন্দ্রিক মানুষের জীবনধারার উপর নির্ভর করেও লোকসংগীতের প্রসার ও প্রকাশে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। অতিসাধারণ মানুষের হাতে লোকসঙ্গীতের কথা-সুর সৃজনের ফলে লোকসুর এত হৃদয়গ্রাহী ও স্বতঃস্ফূর্ত। বাণী ও সুরে স্বাভাবিকভাবেই অকৃত্রিম হৃদয়ের প্রকাশ বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে ম ন মুস্তাফা তাঁর *আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

> রন্ধনশালা থেকে সেই পঞ্চায়েত অথবা নদীর বুক থেকে নিভৃত পল্লীর নিকানো উঠান পর্যন্ত সর্বত্র পল্লীজনের হৃদয়ের কথা উৎসারিত হয় লোকগীতির সুরে ও ছন্দে। লোকসঙ্গীতের একটি মাত্র সুরের আবেশ জীবনের রূঢ়তা এবং একঘেয়েমী থেকে এক শান্ত-সৌম্য-সমাহিত এক কল্পলোকে নিয়ে যেতে সক্ষম। (মুস্তাফা, ১৯৮১ : ২৩৪)

ভারতীয় উপমহাদেশের সকল ভাষার গানের মতো বাংলা গানেও লোাকসংগীতের সুর প্রয়োগের প্রসঙ্গ বহুপ্রাচীন। অষ্টাদশ শতকে সাধক রামপ্রসাদ সেন (আনু. ১৭২০-১৭৮১ খ্রি.) নিজের লেখা গানে লোকসুর ব্যবহার করেছেন। বিশশতকের প্রথম দিকে লোকসঙ্গীতের আঙ্গিকে বাংলা গান রচনার ধারা আরম্ভ হয়। বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫-১৯১১) সময় থেকেই লোকসঙ্গীতের একটি পরিশীলনকৃত রূপ রবীন্দ্রনাথসহ পরবর্তী সকল গীতিকার এবং সুরকারেরা তাঁদের গানে অনুসরণ করেন। সে ধারার অন্যতম সফল সংগীতকার কাজী নজরুল ইসলাম। শৈশবে কবির বেড়ে ওঠা, শিক্ষাগ্রহণ, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনুভূতির সবকিছুই গ্রামীণ আবহের মধ্যে ঘটেছে। পূর্ববতী ও পরবর্তী সংগীতকারদের মধ্যে বাংলা গানের প্রাচীনতম ধারা লোকসঙ্গীতকে বিচিত্রভাবে, বড় পরিসরে কাজী নজরুল ইসলাম উপস্থাপন করেছেন। বিশেষ করে ঝুমুর ও ঝাপান গান পুরোপুরিভাবে অনাদরেই ছিল নাগরিক রচয়িতাদের কাছে।

সুরাবেগের বিশিষ্টতায়, ভাষার সরলতায় লোক পরম্পরায়, সুর প্রবাহের ছন্দময়তায় নজরুলের লোকসুরের গান সার্বজনীন হয়েছে বাঙালির মাঝে। লোকসংগীতকে আধ্যাত্মিক ভাবাবেগে পরিপুষ্ট করার ক্ষেত্রে বাংলা গানের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম ও স্মরণীয় হয়ে আছেন ফকির লালন শাহ। কাজী নজরুল ইসলাম সেই ধারাতেই রচনা করেছেন অসংখ্য লোকসুরের গান। লোকসংগীতকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে মর্যাদার আসনে আসীন করার ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম ও আব্বাসউদ্দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাজী নজরুল ইসলামের রচিত লোকগানের

ধরন ছিল আধুনিক। বিশেষ করে বাণীরচনায়, সুরপ্রয়োগে ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে। নজরুল রচিত লোকসুরের প্রধান বৈশিষ্ট্য বাণীর যথার্থতা অনুযায়ী উপযুক্ত ও আধুনিক সুরের প্রয়োগ। নজরুলের হাতে লোকধারার বিচিত্র সুরের নানা রকমের সুরের বুনন পরিলক্ষিত হয়, যা শ্রোতাদের কাছে গানের সার্বিক মূল্যায়নকে, বোধগম্যতাকে আরও প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট করে তোলে। এরকম গানের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায় : 'তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে একা বসে থাকি', 'আমার গহীন জলের নদী', 'গাছের তলে ছায়া আছে' প্রভৃতি। 'তেপান্তরের মাঠে বঁধু হে একা বসে থাকি' দ্রুত দাদরা তালে নিবদ্ধ গানটি ১৯৩৭ সালে প্রমোদা দেবীর কণ্ঠে রেকর্ড হয়। গানের সুরসৃজন কাজী নজরুল ইসলামেরই। এই গানের স্থায়ী অংশের শেষের দিকে অর্থাৎ 'তারই ধূলা মাখি হে' অংশের সুর অত্যন্ত মনোগ্রাহী এবং লোকধারার সুরের যে আসল বৈচিত্র্য তা প্রকাশ পেয়েছে এ অংশে। গানটি গায়কের কণ্ঠে গীত হবার প্রারম্ভেই এক ধরনের আবেশ তৈরি হয় যেখানে তেপান্তরের মাঠে একা বসে থাকার চিত্রপট চোখের সামনে ভেসে ওঠে সুরের আবেশে। ভাটিয়ালির সুরে রচিত 'আমার গহীন জলের নদী' গানটির প্রথম অন্তরার শেষ লাইনের উদাত্ত সুর মন প্রাণ উদাস করে নেয়। এই অংশে 'এখন সব হারিয়ে তোমার জলে রে আমি ভাসি নিরবধি' এই অংশটুকুতে নজরুল ভাটিয়ালি গানের সমস্ত বৈশিষ্ট্য রজায় রেখেছেন বলে মনে হয়। নজরুলের সুর করা এ গান ১৯৩২ সালে শিল্পী ধীরেন্দ্রনাথ দাসের কণ্ঠে প্রথম রেকর্ড হয়। নজরুলের রচিত লোকসুরের গানের ছন্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ। গানের পটভূমি, সুর প্রভৃতি বিবেচনায় এনে ছন্দ ব্যবহার করতেন নজরুল। ছন্দের মনভোলানো দোলাতে বহু গান বেশি পরিমাণে বাঙালি শ্রোতাদের কাছে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গান– 'চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিস রে চোখ গেল পাখি', 'ঝুমঝুম ঝুমরা নাচ নেচে কে এলোরে' প্রভৃতি। নজরুল রচিত লোকসুরের গানের মধ্যে লোকসঙ্গীতের এমন কোনো আঙ্গিক নেই যা তাঁর রচনার মধ্যে আনেননি। লোকসঙ্গীতের সব ধারায় কাজী নজরুল ইসলাম গান রচনা করেছেন। ভাষার বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে গানে আঞ্চলিকতারও প্রকাশ রয়েছে।

প্রকৃতির গ্রীষ্মকালীন কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডব কবির মনকে যেমন করেছে অসীম সাহসী আবার ঝড়ের বেগের মতোই সৃজন উন্মাদ, তেমনি বর্ষাও নজরুলের মনের গহীনে প্রণয় কাতরতার চির বিরহবিধুর ভাব জাগিয়ে তুলেছিল।

একথা সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, লোকজীবনের বৈচিত্র্যের মনোহর ছবি নজরুলের লোকসুরের গানে বিদ্যমান। পল্লিবাংলার রূপ লাবণ্যে লালিত মাঠ ভরা ধানের গান, জলে ভরা দিঘির গান, উদাস বাউলের গলা ভরা গানের সব সুর স্থান পেয়েছে নজরুলের রচিত লোকগানে। বৃষ্টির আশায় প্রাণী, বৃক্ষ আর কৃষককুলের আকাশের পানে চেয়ে থাকার পর আউশের ক্ষেত জলে ভরে যায়, বর্ষা তার জলের ভাণ্ডার উদার করে দিয়ে থৈ থৈ জলে পথ ঘাট ডুবিয়ে দিয়ে যায় ঘন বর্ষার দিনে। শুভ্র পূজারিণীর বেশে হিমেল শীতল বনছায়ায় হেমন্তের রূপ ধরা পড়ে নৈসর্গিক বাংলার প্রকৃতিতে। কুয়াশার চাদরে প্রকৃতির শরীর ঢেকে দেয় শুভ্র ঘন কুয়াশা, কুসুম সৌখিন দখিন হাওয়া নিয়ে আবির রঙে রাঙিয়ে আসে বসন্তকাল। নব কিশলয়ে তখন প্রকৃতি সাজে নতুন সাজে। নজরুলের লোকধারার গানে অসাম্প্রদায়িকতার যে নিদর্শন দেখতে পাই তার মূল কারণ, তাঁর লোক চেতনাবোধ, লোক দর্শন। লোকায়ত চেতনার সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের

আত্তীকরণ ঘটেছিল শৈশব থেকেই। তাই তাঁর লোকগানেরও এত বৈচিত্র্য। গ্রাম বাংলার এবং প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য রূপ ধরা পড়েছে নজরুলের লোকঅঙ্গের গানে এবং প্রকৃতি বিষয়ক গানে। লোক ঐতিহ্যের সকল রূপ-লাবণ্য নজরুল তাঁর জীবনমালায় জড়িয়ে নিয়ে তাঁর সব গানে অপূর্বভাবে ব্যক্ত করেছেন। গ্রামীণ চিরায়ত লোকজরূপের বন্দনা গাওয়া হয়েছে নজরুলের লোকগানে। প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যের অপরূপ রূপ অবলোকনের প্রতিদান স্বরূপ এবং নয়নাভিরাম রূপের ঐশ্বর্য চিরস্থায়ী করতে অতুলনীয় পারদর্শিতায় গানে গানে তাদের গৌরবগাঁথা রচনা করেছেন নজরুল। তুলনাহীন পারঙ্গমতায় বাংলার প্রকৃতির বারোমাসি রূপ নজরুলের লোকসুরের গানে প্রতিভাত হয়েছে।

সহায়কপঞ্জি

আশরাফুল আলম (২০০১)। *নজরুল সংগীতে লোক ঐতিহ্য ও লোক সুর*। নজরুল ইন্সটিটিউট পত্রিকা (বিশেষসংখ্যা), নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

করুণাময় গোস্বামী (১৯৯৬)। *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

(১৯৯০)। *বাংলা কাব্যগীতির ধারায় কাজী নজরুল ইসলামের স্থান*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

জাহিদুল কবীর (২০১৭)। *ভাটিয়ালী গানের উদ্ভব ও বিকাশ*। অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা।

ম ন মুস্তাফা (১৯৮১)। *আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে*। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।

মোহাম্মদ আবুল খায়ের (২০১৪)। *নজরুল সংগীতে নান্দনিকতা*। অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪১১)। *সংগীত চিন্তা*। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

রশিদুন্ নবী (সম্পা., ২০১৪)। *নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ*। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

(২০১৯)। *নজরুল সংগীতের নানা অনুষঙ্গ*। অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।